The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 183 - 192)
Published in February, 2025

উপকথায় অন্তরিত জনজীবন : প্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কালকেতু উপাখ্যান'

কাকলী পাল *

প্রতিপাদ্যসার: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তববাদী চিত্রাঙ্কনে তিনি অনন্য। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জীবনবাস্তবতার প্রত্যক্ষ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার হলেও তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যানে' দেবমাহাত্ম্য প্রচারের আড়ালে ব্যাধ কালকেতুর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তৎকালীন সমাজবাস্তবতার নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম 'কালকেতু উপাখ্যানে'র পশুকাহিনি অংশে কালকেতুর নির্যাতনের শিকার পশুগণের করুণ জীবনচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন সামন্তশাসিত সমাজব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্রই যেন তুলে ধরেছেন। জীবজন্তু ও পশুপাখিকে নিয়ে রচিত উপকথার অন্তরালে মনুষ্যপ্রকৃতির স্বরূপ ও মানবজীবনের কাহিনিই রূপায়িত হয়। উপকথায় পশুপাখির চরিত্রগুলো মানবচরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে 'কালকেতু উপাখ্যানে' বর্ণিত পশুকাহিনির সাথে জনজীবনের নানা অনুষঙ্গের সম্পৃক্ততা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আদিমকালে মানুষ যখন অরণ্যচর ও গুহাবাসী ছিল তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বশীভূত করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ ও ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। সাহিত্যের মধ্যেও প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, অরণ্য, নদ-নদী প্রভৃতি সবকিছুই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানবজীবনের পাশাপাশি প্রকৃতির নানা উপাদানের অস্তিত্বও বিরাজমান। কখনো প্রকৃতির নানাবিষয়ের বর্ণনার আড়ালে মানবজীবনই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। আবার কখনো প্রকৃতির কোনো উপাদান মানবস্বরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যসম্ভারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপকথা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার মধ্য দিয়ে জীবজন্তু ও পশুপাখির রূপকে (Allegory) মানুষের অন্তরিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যানে' বর্ণিত পশুকাহিনিতে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র, জনজীবনে চর্চিত নানা বিষয় ও মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উপকথা ও মঙ্গলকাব্য

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌখিক ও লিখিত দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে মৌখিক ধারাটি প্রাচীন। মৌখিক ধারাটির সৃষ্টি লোকমুখে এবং মুখে মুখেই তা প্রচার লাভ করেছিল। লোকমুখে সৃষ্ট এবং লোকমুখে প্রচলিত এই সাহিত্যগুলোকেই লোকসাহিত্য বলা হয়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথমদিকে লোকসাহিত্যগুলোর কোনো লিখিত রূপ ছিল না। পরবর্তীতে এই সাহিত্যগুলোকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার তাগিদেই লিখিত রূপে প্রকাশ করা হয়। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত লোককথার অন্যতম শাখা উপকথা। জীবজন্তু ও পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রচিত হয় সেগুলোকেই উপকথা বলা হয়। জীবজন্তুর এসব কাহিনির অন্তরালে মানুষ নিজের কাহিনি ও স্বরূপকেই প্রকাশ করেছে। শুধু পশুপাখির চরিত্রই উপকথার বিষয়বস্তু নয়, মানবচরিত্রও এখানে উঠে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে পশুপাখি রূপক মাত্র। লোককথার আরেকটি শাখা ব্রতকথা। ব্রতকথার উদ্দেশ্য দেবমাহাত্ম্যকীর্তন। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলো রচিত। এই ব্রতকথাগুলো থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্য হলো দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারধর্মী ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য। ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হলেও অনেকসময় নতুন বিষয়বস্তু অবলম্বনেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্যপ্রচারধর্মী ধর্মবিষয়ক এই মঙ্গলকাব্যগুলোতে লোকসাহিত্যের নানা লোক-উপাদানের অস্তিত্ব বিরাজমান। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে" (৯৩)।

উপকথার গুরুত্ব

সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে উপকথার মূল্য অপরিসীম। উপকথায় জীবজন্তুর কাহিনির আড়ালে মানবজীবনের কাহিনিই বর্ণিত হয়। "প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষের মনে যখন কাহিনীর উদ্ভব ঘটে, তখন সে কাহিনীর স্বাভাবিক নায়কত্ব আরোপিত হয় সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, বৃষ প্রভৃতি প্রাণীর উপর। এই সব আরণ্যক কাহিনী রচনার অনেক পরে প্রাকৃতিক শক্তিকে অবলম্বন করে অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব ঘটে, এরও অনেক পরে কাহিনীর মধ্যে মানুষই নিজে নায়ক সেজে বসে" (মুহম্মদ আবদুল খালেক, ৩৯৮)। উপকথার মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মানুষের পাশবিক আচরণের পরিবর্তন ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের ইতিহাস উঠে আসে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও প্রাণীর জীবন-যাপন ও আচরণে তেমন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ সভ্য হতে শেখে যার প্রভাব সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর মতে,

> আদিম সমাজ প্রকৃতির নিকট সম্পর্ক ছিল বলে জীবজন্তুও তাদের কাছে অত্যন্ত আপন জন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। Animism বা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানবসভ্যতা স্বভাবতই জীবজন্তুর গল্পে নিজেদের প্রকৃতিকেই আরোপ করেছে। মানুষের বোকামি অসঙ্গতি তাই স্বভাবতই জীবজন্তুর কাহিনীতে স্থান করে নিয়েছে।... জীবজন্তু মানুষের গুণপ্রাপ্ত (২৪২)।

সেই হিসেবে উপকথাগুলো মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিরূপ। জনজীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে এই কাহিনিগুলোতে। উপকথার কাহিনিগুলোর আড়ালে সমকালীন সামাজিক অবস্থা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনের চালচিত্রও অঙ্কিত হয়। সমাজবাস্তবতা সম্পর্কিত পাঠ বিশ্লেষণে উপকথাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবজন্তুর চরিত্রে মানবিক গুণ আরোপিত হওয়ায় সমকালীন সমাজবাস্তবতার আলোকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা যায়। সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটলেও ভারতীয় উপকথাগুলো বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করেছে। উপকথাগুলোর পাঠভেদ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। এসব উপকথাগুলোর বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনায় নৃতত্ত্বের নানা মূল্যবান তথ্য, ভারতবর্ষের সাথে বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায় (আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, ১৪)। এভাবেই লোকসমাজে জন্ম নেওয়া উপকথাগুলো দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে উঠে।

কালকেতু উপাখ্যান

মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অন্যতম। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে দুটি উপাখ্যান আছে- (১) কালকেতু উপাখ্যান (২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। 'কালকেতু উপাখ্যানে' কালকেতু নামে এক ব্যাধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর চণ্ডীদেবীর পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যে এসে এক ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। মর্ত্যে তার নাম হয় কালকেতু। নীলাম্বর-পত্নী ছায়া মর্ত্যে এসে ফুল্লরা নামে পরিচিত হলো। মর্ত্যজীবনেও তারা স্বামী-স্ত্রী। ব্যাধ কালকেতুর জীবন ও জীবিকা অরণ্যে পশুশিকারের ওপর নির্ভরশীল। কালকেতুর পশুশিকারজনিত অত্যাচারে বনের পশুরা অতিষ্ঠ হয়ে চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলো। চণ্ডীদেবী তাদেরকে অভয় প্রদান করে লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে একটি স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করলেন। কালকেতু বনে গিয়ে কোনো শিকার না পেয়ে স্বর্ণগোধিকাটি নিয়ে ঘরে ফিরল। ফুল্লরা ও কালকেতুর অবর্তমানে চণ্ডীদেবী কালকেতুর গৃহে ষোড়শী যুবতীর রূপ ধারণ করলেন। গৃহে ফিরে চণ্ডীর যুবতীরূপ দেখে সপত্নী আগমনের আশঙ্কায় ফুল্লরা ও কালকেতুর মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হলো এবং উভয়েই নারীরূপী চণ্ডীদেবীকে নিজগৃহে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাল। অবশেষে দেবী নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে অনেক ধন-সম্পদ প্রদান করে গুজরাটে নগর পত্তন করতে বললেন। কালকেতু কর্তৃক গুজরাটে নগর পত্তনের পর দেবী তাকে গুজরাটের অধিপতি বানিয়ে দিলেন। গুজরাট নগরের অধিপতি হওয়ার পর ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্তলোকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতু বন্দি হয়। অবশেষে চণ্ডীদেবীর কৃপায় সে মুক্তিলাভ করে এবং মর্ত্যলোকে চণ্ডীপূজা ও চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রচার লাভ করে।

'কালকেতু উপাখ্যানে' অন্তরিত জনজীবন

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যানে' কিছু পশুচরিত্র আছে যাদের আচরণে মানবচরিত্রের ছাপ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ় বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,-জলে স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবনসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন" (৪৩৬)। 'কালকেতু উপাখ্যানে'র কালকেতুর মৃগয়া, সিংহের নিকট পশুগণের নিবেদন, সিংহের নিকট বাঘিনীর আবেদন, পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, পশুগণের ক্রন্দন, চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন, চণ্ডীর প্রশ্ন ও পশুগণের উত্তর প্রভৃতি অংশে পশুগণের যাপিত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। 'কালকেতু উপাখ্যানে'র পশুগণ যেন পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে মনুষ্যসমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তারাও যেন মানুষের মতোই সমাজবদ্ধ জীব, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেন তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। কালকেতুর নির্যাতনে পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে পশুগণের বিলাপের যে চিত্র মুকুন্দরাম এঁকেছেন তার আড়ালে মনুষ্যসমাজেরই পারিবারিক বন্ধনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পশুগণের আকুতি ও ক্রন্দনের অন্তরালে মানবাত্মার আর্তনাদই প্রতিফলিত হয়েছে। মুকুন্দরাম সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের ওপর অত্যাচারের কাহিনি পশুগণের রূপকে (Allegory) তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন পশু সমাজের এক একটা শ্রেণির প্রতিনিধি। পশুগণের ক্রন্দন অংশে পশুরাজ সিংহ থেকে শুরু করে বাঘ, শরভ, গণ্ডার, কোক (নেকড়ে), ভালুক, বরাহ, হাতি, বানর, হরিণ, শজারু, নকুল পর্যন্ত কেউই কালকেতুর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই পশুগণ সবাই সেই সময়কার নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। আর কালকেতু অবতীর্ণ হয়েছে অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায়। পশুগণের এই ক্রন্দন যেন সেইসব শোষিত, নির্যাতিত মানুষেরই বিলাপ। কবির নিপীড়িত, নির্যাতিত জীবনের স্বীয় অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কাব্যের এই অংশে। পশুগণের যার যা কিছু সহায় সম্পদ বা যা কিছু ক্ষমতা সেটাই যেন তাদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল। এটা যেন নিরীহ প্রজাদের জীবনের সেই চিত্র, যার যা কিছু সম্পদ আছে তা দিয়েই রাজকর পরিশোধ করতে হবে। রূপক

চরিত্রে প্রজানিপীড়নের বাস্তব চিত্র এটি। আবার সহায় সম্বলহীন সাধারণ পশুগণও নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি সেকালের নিঃস্ব অসহায় প্রজার মতো।

'কালকেতু উপাখ্যানে' কালকেতুর শিশুবয়স থেকে পশুগণের সাথে তার বিভিন্ন ধরনের আচরণের চিত্র দেখা যায়। বাল্যকালেও সে খেলার ছলে পশুগণের ওপর অত্যাচার করত। বাল্যকাল থেকেই সে পিতার সঙ্গে শিকারে যেত। শিকার করার বিভিন্ন কৌশল তার আয়ত্তে ছিল। পশুগণের ওপর কালকেতুর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে 'কালকেতু উপাখ্যানে'র বিভিন্ন অংশে। কালকেতু যেন বৃহন্নলা অর্থাৎ ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের মতো কুরুরাজসেনাতুল্য পশুসেনাদের বধ করে চলেছে। কালকেতুর পরাক্রমের চিত্র-

> অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
> কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২২)।

কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ, বিপর্যস্ত পশুগণ ক্রন্দন করতে করতে তাদের মর্মবেদনা বর্ণনা করে গেছে। পশুসমাজে হাতির বড় নাম-ডাক। হাতি যখন বলে–'বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর' তখন একটা বিশালদেহী শক্তিশালী পালোয়ান টাইপ চরিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু সেও কালকেতুর শক্তি ও কৌশলের কাছে বিপর্যস্ত। হাতিকে তার মহামূল্যবান দাঁতের জন্য কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হতে হলো। যমের বাহন হিসেবে মহিষের একটা আলাদা পরিচয় ও সম্মান আছে। তবুও মহিষ শিং-এর জন্য কালকেতুর নিপীড়নের শিকার হলো। মহিষের মর্যাদা ও ক্ষমতা কালকেতুর কৌশলের কাছে তুচ্ছ। চমরী গরুর শত্রু হলো তার নিজের লেজ। কালকেতু চমরী গরুর লেজ কেটে তা দিয়ে চামর বানিয়ে বিক্রি করে। চমরী গরু লেজের জন্য কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হলো। গণ্ডারের দুঃখের কারণ তার খড়্গ। গণ্ডারের খড়্গ মানুষ তর্পণের জন্য কেনে। গণ্ডারের খড়্গ-কোষে তর্পণের সময় জলদান করলে পিতৃলোকের (মৃত পূর্বপুরুষ) অনন্ত তৃপ্তি লাভ হয়। খড়্গের জন্যই কালকেতু গণ্ডার শিকার করে। হাতি, মহিষ, চমরী, গণ্ডার প্রভৃতি পশু সামন্তশাসিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। সামন্তশৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রজাগণ যেমন তাদের সম্পদ দিয়ে রাজকর পরিশোধ করত, নইলে নির্যাতনের শিকার হতে হতো পশুগণও তেমনি তাদের সম্পদের জন্য কালকেতুর অত্যাচারের শিকার হলো। রাজশক্তির কাছে প্রজার জীবন, মান-মর্যাদা সবকিছুই তুচ্ছ ছিল। সামন্তশৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে ক্ষুদিরাম দাস বলেন, "কবিকঙ্কণ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থা ও প্রজা-সম্পর্কের প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সন্নিবেশ করেছেন... এতে নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতাব্দীর বড় রাজা ও ছোট রাজা বা জমিদারদের প্রশাসন-কার্যাবলী ও প্রজাদের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে।... প্রজা সম্পর্কে জমিদার প্রায় সার্বভৌম রাজার মতই থাকতেন। কিন্তু বড় রাজার কাছে তাঁকে কর পাঠাতে হ'ত, আর জমিদারিতে গুরুতর অন্যায় ঘটলে বা জমিদার তাঁর নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে কিছু অধিকার করলে রাজা সহ্য করতেন না" (৩৮)।

কালকেতু খড়্গের জন্য গণ্ডকির স্বামী ও ভাইকে হত্যা করেছে। স্বামীহারা গণ্ডকির দুরবস্থার চিত্র-

> স্বামীরে বর্ণিয়া কান্দে গণ্ডকি রণ্ডিকা।
> সদাই শোঙরে শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা।।
> প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
> উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩০)।

এখানে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে নারীর দুর্গতির চিত্র ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। স্বামীকে হত্যা করায় বিধবা স্ত্রী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। স্বামী আর সহোদরকে

হারানোর শোকের পাশাপাশি তার এখন উদরের জ্বালাটা বড় হয়ে উঠেছে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে পুরুষই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। যদিও কিছুক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন- ফুল্লরা, নিদয়া, হিরা। এরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারী।

ভালুক চরিত্রে অসহায় নিরীহ সাধারণ প্রজার চিত্র ফুটে উঠেছে। সামান্য সাধারণভাবে আহার করে কোনো রকমে দিনাতিপাত করে সে। তারপরও তার দুর্গতির শেষ নেই। নিপীড়িত ভালুক বলে-

> উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
> নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।
> সাত পুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল পাশে।
> সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩০)।

অনেক সমালোচক মনে করেন ভালুকের এই বর্ণনাটি লেখার সময় কবির তাঁর প্রভু গোপীনাথ নিয়োগীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। গোপীনাথ নন্দী ছিলেন সজ্জন, প্রজাবৎসল তালুকদার, যিনি রাজরোষে বিপাকে পড়ে বন্দি হন। ভূদেব চৌধুরীর মতে, "পশুজীবনে মানবাচরণের কাল্পনিক বাতাবরণ রচনার পন্থায়, মুকুন্দরামের অন্তর্ব্যথিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি যেন এখানে কথা বলে ওঠে। 'তালুক'ধারী গোপীনাথ 'নেউগি'-র দুর্দশার স্মৃতি!" (আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৪৬)।

শরভ সিংহের চেয়ে বলবান এক প্রকার পৌরাণিক মৃগ। অন্য মৃগগণ যেখানে চার পা-বিশিষ্ট সেখানে শরভের আট পা। তার বিশেষ কুলগৌরব এটি। আট পা-বিশিষ্ট শরভ অতিশয় দ্রুতধাবনের ক্ষমতা রাখে। এই বিশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও সে কালকেতুর কাছে পরাজিত হয়। বারশিঙ্গা, তুলারু, ঘোড়ারু, ঢোলকান প্রভৃতি নানাজাতের হরিণেরও আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে। তবু তারা কালকেতুর কাছে অসহায়। ধরায় লুটিয়ে অসহায় হরিণ আর্তনাদ করছে। বিধাতার ওপর তার অভিমান কেন বিধাতা এমন পাপবংশে তার জন্মগ্রহণ করালেন, যে বংশে পশুগণ নিজের মাংসের জন্য ভুবনের বৈরী অর্থাৎ শত্রুতে পরিণত হয়। হরিণের জিজ্ঞাসা-

> কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
> হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১)।

চর্যাপদেও চিত্রটি দেখা যায়- 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'। হরিণের নিজের গুণ বা সম্পদই তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

বানর কেঁদে কেঁদে বলে যে তার বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রামের সেনাপতি। রাম-রাবণের যুদ্ধে সমুদ্রের ওপর পাথর দিয়ে সেতু বানিয়ে সাগর বন্ধন করে তার বৃদ্ধ পিতামহ দলবল নিয়ে রামচন্দ্রকে সহায়তা করেছিল। সীতা উদ্ধারেও বানরদল রামকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বিধির লিখনে তার কপালে এত দুঃখ যে কালকেতু তার সাত পুত্রকেই জালে বেঁধে নিয়ে গেল। পুত্রদের হারিয়ে তার কাছে সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেল। মিরাস, বিষয়-সম্পত্তি কোনো কিছুতে আর তার আগ্রহ নেই। পিতামহ রাম-সেনাপতি, এই কুলগৌরবও যেন কালকেতুর বীরত্বের কাছে ম্লান হয়ে গেল। বানরের দুঃখবর্ণনার চিত্র-

হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে।
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে।।
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি।
সাগর বান্ধিয়া কৈল শ্রীরামের হিতি।।
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র মহাবীর বান্ধি নিল জালে।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১)।

এটা যেন স্বজনহারা নির্যাতিত প্রজার বিষয়-সম্পত্তিতে আসক্তি ত্যাগের চিত্র। কৃষকপ্রজা মুকুন্দরামও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সামন্তপ্রভুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে কিংবা তাদের নির্যাতনের ভয়ে পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি ও বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। "কবি নিজের জীবন দিয়ে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই তাঁর কাছে মূর্ত হয়েছে" (অরবিন্দ পোদ্দার ১৯৯৯, ৬৩)।

বরাহের বেলায় দেখা যায়, বরাহ আদি বীর। বরাহ অবতারে বিষ্ণুদেব বন্য শূকরের রূপ ধারণ করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিষ্ণুদেবতা বরাহ অবতারে হিরণ্যক্ষ নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভূ-দেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। সেই আদি বীরের বংশধর হয়েও বরাহ কালকেতুর হাত থেকে নিস্তার পেল না। বরাহ জানায় যে, সে মুথাভোজী। আহার্য বস্তুর জন্য তার কাউকে হিংসা করার প্রয়োজন পড়ে না। কালকেতুর অত্যাচারে তার বংশগৌরবও ম্লান হয়ে গেল। সেও একে একে তার স্বামী, শাশুড়ি, ননদ, দেবর, ভাসুর, পুত্র সবাইকে হারাল। একমাত্র পুত্রের শোক সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রের পাশাপাশি স্বামী-পুত্র, পরিবার-পরিজন হারানো এক বিধবা অভাগীর হৃদয়বেদনা ও জীবন-যন্ত্রণা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। নিপীড়িত বরাহের জীবনচিত্রে দেখা যায়-

ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর আদি বরাহ।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা।।
শাশুড়ী-ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।।
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো।
পাশরিতে নারি গো তাহার মায়া মো।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১)।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিংবা শক্তিমান হলেও রাজনৈতিক কারণে অনেকেই যে সবংশে নির্বংশ হতো এটা যেন তারই চিত্র। উপকথায় শিয়াল (শিবা) চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও কালকেতুর কাছে সে অসহায়। শিয়ালের মাংস থেকে বৈদ্যগণ শিবাঘৃত তৈরি করে যা উন্মাদ রোগের ওষুধ। শিয়াল সেই মাংসের জন্যই কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হলো।

কালকেতুর অত্যাচারে নকুলও বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে হারিয়ে শোকে কান্না করছে। শোকার্ত নকুল বলে-

চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩২)।

বাঙালির জীবনে বৃদ্ধবয়সে পরিবার-পরিজনই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থল। বৃদ্ধ বয়সে পরিবার-পরিজন হারিয়ে নকুল চরিত্রে অসহায়তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পবনের চেয়ে দ্রুতগামী খরগোশও কালকেতুর হাত থেকে নিস্তার পায় না। জীবন্ত খরগোশ ধরে ঘরে ঘরে বিক্রি করে সে, যেমন করে রাজকর্মচারীরা নিরীহ প্রজাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের কার্যোদ্ধার করত। সজারু শশারুও কেঁদে কেঁদে ভূমিতে গড়াগড়ি খায়। গর্তের ভিতর লুকিয়ে থেকেও কালকেতুর হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। কালকেতু গর্তের ভেতর পানি ঢেলে দিয়ে তাদেরকে বের করে আনে। এরাও পরিবার-পরিজন নিয়ে কালকেতুর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। শজারু বলে-

গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানী।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১-৩২)।

এখানে কবির সমকালীন জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। প্রজারা যাতে পালাতে না পারে বা আত্মগোপন করতে না পারে সেই কারণে পেয়াদা সবার দুয়ারে হানা দিত। ঠিক তেমনি বনের পশুও যাতে গর্তের ভেতর আত্মগোপন করতে না পারে সেজন্য কালকেতু গর্তের ভেতর পানি ঢেলে তাদের বের করে আনে। ভূদেব চৌধুরীর মতে, "মুকুন্দরামের গভীর জীবন-অভিজ্ঞতা কত নিপুণ ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন আভাসে সঞ্চারিত হয়ে আছে এ-সব চিত্র-রেখায়নে" (আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৪৬)।

আদি ক্ষত্রিয় বাঘও কালকেতুর বীরত্বের কাছে তুচ্ছ। কালকেতু বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পশুশিকার করে। ফলে শক্তিশালী পশুগণও তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। বাঘের নখ, ছাল প্রভৃতি কালকেতুর জীবিকা অর্জনের অবলম্বন। এসবের জন্য বাঘ কালকেতুর নিপীড়নের শিকার হলো। কালকেতুর অত্যাচারে রায়বার (রাজার বার্তাবাহক) কোকও ছেলেমেয়ে হারিয়ে কাঁদছে। কালকেতুর অত্যাচারে বনের সমস্ত পশুর জীবন বিপর্যস্ত। তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। জীবনের অসহায়ত্ব ও দুঃখ বর্ণনা ছাড়া তাদের মুখে যেন আর কোনো বুলি নেই। "কালকেতুর অত্যাচারে পশুদের ক্রন্দনের ভাষায়ও রাজকীয় অত্যাচারে পীড়িত ভূমিভিত্তিক মানুষের ক্রন্দন শ্রুত হয়েছে" (ক্ষেত্র গুপ্ত, ৪)।

অত্যাচার সইবার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কালকেতুর নির্যাতনে নিপীড়িত পশুগণের ক্ষেত্রেও এই চিত্র দেখা যায়। কালকেতুর অত্যাচারে নির্যাতিত পশুগণের সঙ্গে বাঘিনী এসে মৃগরাজ সিংহকে প্রশ্ন করে যদি সে প্রজাপালন করতে না পারে তাহলে কেন মৃগরাজ হলো। বাঘিনীর জিজ্ঞাসা-

যদি পশুগণ না কৈলা পালন
কেনে হৈলা মৃগরাজ।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২৬)।

এ যেন মধ্যযুগীয় প্রজার মুখে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর; তৎকালীন শাসনব্যবস্থার প্রতি কবিমনের সুপ্ত জিজ্ঞাসার প্রতিফলন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ যেমন নিজ প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধান করে পশুগণও তেমনি তাদের সমস্যা সমাধানে একতাবদ্ধ হয়েছে। সেকালে নিরীহ প্রজাগণের রাজার কাছে অভিযোগ জানানোর সুযোগ না থাকলেও মুকুন্দের কাব্যের পশুগণ কিন্তু তাদের অভিযোগ একজোট হয়ে রাজার কাছে উত্থাপন করেছিল, যাতে পরবর্তীকালের গণতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে উঠেছে। কবি নিজের জীবনে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন তার প্রতিকার তিনি করতে না পারলেও কবির কাব্যের পশুগণ কিন্তু আধুনিককালের প্রজাগণের মতো রাজার রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে ব্যর্থতার অভিযোগ পশুরাজের কাছে তুলে ধরেছিল। পশুগণের অভিযোগের এই চিত্রটিতে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রজার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, "পশুকাহিনীতে

রাজশক্তির পঙ্গুত্ব বিবৃত হয়েছে। রক্ষক রাজশক্তি বিপদ থেকে উদ্ধার করে না। দুর্বল ও নিরপরাধীরা বিনা অপরাধে শাস্তি পায়" (আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা. ১৬৫)।

বাঘিনী সিংহকে বলে-

শুন শুন রায় মাঙ্গিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।।
নারীগণ সঙ্গে থাক লীলারঙ্গে
না কর দোষ বিচার।
বীর কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২৬)।

পশুরাজ সিংহ রাজ্যশাসনে মন না দিয়ে ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকায় তার রাজ্য সুরক্ষিত ছিল না। ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে তার রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কালকেতুর অত্যাচারে নিপীড়িত পশুগণ যখন দেখল যে তাদের রক্ষাকর্তা কেউ নেই তখন তারাও বাধ্য হয়ে বনত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। এখানেও কবির ব্যক্তিগত জীবনে নির্যাতনের শিকার হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটা পরিত্যাগের ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ নানা লীলারঙ্গে, ভোগবিলাসে, আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করে। গরিব প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভিযোগ শোনার মতো কেউ থাকে না। রাজারও প্রজাপালনের দিকে কোনো সুদৃষ্টি থাকে না। তখন নির্যাতনের শিকার গরিব প্রজারা বাধ্য হয়ে নিজের পরিচিত ভুবন, ভিটে-মাটি, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায়। অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, "মেয়ে বাঘটির এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই কালে সেই সমাজে বিচরণশীল মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়; অথবা মানুষের অভিজ্ঞতাই এই উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেয়বোধমুক্ত ক্ষয় ও অনাচার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও শ্রেণীর হৃদয়হীন শাসন, এই উভয়ের চাপেই সাধারণ মানুষ ভয়বিস্ময়ে অভিভূত" (৬৩)। রাষ্ট্রে যখন বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে, রাজা যখন রাষ্ট্রপরিচালনা ও প্রজাপালনে উদাসীন থাকে তখন রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট হয়। তখন রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর আক্রমণে সহজেই পরাস্ত হয় এবং জনজীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে।

পশুরাজ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগে বাঘিনীর মুখে যে শক্তিধর বুলি উচ্চারিত হয়েছে তার ফলে সিংহের আচরণেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পশুরাজ কর্তব্যসচেতন হয়ে রাজ্যের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজ্যরক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। সিংহ পশুদের দুঃখের বর্ণনা শুনে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু যুদ্ধে কালকেতুর রণকৌশলের কাছে পশুরাজও পরাজিত হলো। পরাজিত সিংহের অনুরূপ চিত্র দেখা যায় কবির তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর বেলায় যিনি কিনা রাজনৈতিক কূটকৌশলে বিপাকে পড়ে বন্দি হলেন এবং তাঁর দুরবস্থা দেখে কবিসহ গ্রামের অসহায়, নিরীহ অনেক প্রজা গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই চিত্রে মনে হয়, কালকেতু যেন মুকুন্দরামের অঞ্চলের অত্যাচারী শাসক ডিহিদার মামুদ সরীপ, মৃগরাজ সিংহ যেন তালুকদার গোপীনাথ নন্দী এবং কবি নিজে যেন বনের অসহায় প্রজা পশুদের প্রতিনিধি। এখানে কবির সমকালীন অবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্ভোগের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নীলিমা ইব্রাহিমের মতে- মামুদ সরিফ তার প্রজাদের যে অত্যাচার করেছেন পশুদের মুখ থেকে কালকেতু সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ অভিযোগ পশুরাজ সিংহের কাছে আনা হয়েছে। যে স্বৈরতন্ত্রের শিকার কবি

নিজে হয়েছিলেন সেই মানবিক অনুভূতি ও সহানুভূতির দ্বারা তিনি পশুর দুঃখ বর্ণনা করেছেন (শিপ্রা সরকার, ৯৯)।

পশুদের জবানিতে কবি যেন নির্যাতিত মানুষের দুঃখগাথাই উপস্থাপন করেছেন। তারপর নির্যাতিত অন্য পশুদের সঙ্গে মৃগরাজ সিংহ কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলো। চণ্ডীদেবী তখন জনে জনে তাদের দুঃখের কথা জানতে চাইলে তারা বলে যে কালকেতু মহাবীর। বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগ করে সে পশুশিকার করে। ফলে তার হাত থেকে ছোট-বড়, সবল-দুর্বল, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন কারোরই নিস্তার লাভ সম্ভব নয়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বলেন- দেবী চণ্ডীর নিকট পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারের কথা করুণ ভাষায় নিবেদন করিতে লাগিল। পশুগণের এই ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিলেই তৎকালীন শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষের করুণ ক্রন্দনের সুরটুকু শোনা যায় (শিপ্রা সরকার, ৯৯)।

কালকেতুর অত্যাচারে পশুসমাজের জীবনযাপনের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে একটা অঞ্চলের জনজীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, জীবনযাপনের স্বাভাবিক গতি কীভাবে থমকে যায় এবং জনজীবন অস্তিত্ব সংকটে ভোগে মুকুন্দের কাব্যের এই অংশ তারই সাক্ষ্য দেয়। কালকেতুর অত্যাচারে জর্জরিত বনের পশুদের এই অসহায়তার চিত্র যেন সামন্তপ্রভুর অত্যাচারে নির্যাতিত অসহায় প্রজাগণের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। "মুকুন্দরামের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে পশুরাজ্যের বিবরণে।... মুকুন্দরাম নিপীড়িত, বিপদগ্রস্ত, অসহায় পশুজীবনের এক রসগ্রাহ্য বর্ণনা দিয়েছেন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে। একটা উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারিত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছবি আঁকবেন, কবির তাই ইচ্ছা" (ওয়াকিল আহমদ, ৩১২)।
বনের নির্যাতিত পশুগণ কালকেতুর অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের আশায় চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলে দেবী তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করে বলেন-

> আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
> না বিধবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩৬)।

পশুগণের চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হওয়ার এই চিত্র যেন নিজ রাজ্য ও অস্তিত্ব রক্ষায় উচ্চদরবারে আবেদন জানানোর চিত্র। দেবী পশুগণকে দেওয়া তার কথা রেখেছিলেন। তিনি কালকেতুকে নবনির্মিত গুজরাট নগরের অধিপতি করে দিয়েছিলেন। ফলে কালকেতুর আর পশুশিকারের প্রয়োজন পড়েনি।

মুকুন্দরাম বনের পশুদের ওপর কালকেতুর অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সামন্তপ্রভু কর্তৃক নির্যাতিত প্রজার জীবনচিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, "তৎকালীন সমাজে দুর্বল নিরপরাধের ওপরে প্রবলের নির্বিচার অত্যাচার বিনা বাধায় সংঘটিত হত, পশুকাহিনীতে তারই ভূমিকা রচিত হয়েছে" (আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৬৫)।

বনের পশুদের সাথে কালকেতুর আচরণ তাকে অতিশয় অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে ঠিকই কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ছিল তার জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই যেন কালকেতু একজন অত্যাচারী শাসকে পরিণত হয়েছিল। সামন্তপ্রভুগণও তাদের ওপরের স্তরের রাজব্যক্তি ও কেন্দ্রীয় শাসকের অধীন ছিল। তাই তারাও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে অনেক সময় বাধ্য হয়ে কিংবা স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রজাপীড়ন করত। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই তৎকালীন 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ' এমনকি বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। শুধু মানবসমাজ নয় সমস্ত জীবজগতের মধ্যেই এই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই বিরাজমান।

মুকুন্দরাম 'কালকেতু উপাখ্যানে' পশুকাহিনি অবলম্বনে রচিত উপকথায় পশুদের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে সমকালীন সমাজের বাস্তবচিত্রই তুলে ধরেছেন প্রচ্ছন্নভাবে। পশুচরিত্রে আরোপিত হয়েছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য। পশুচরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তৎকালীন জীবনবাস্তবতার চিত্র। সমালোচকের মতে, "'উপকথা'র ভিত্তি যে বাস্তব জীবন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই,... 'উপকথা'র জীবন নিত্য মানুষের শাশ্বত জীবন– তা পশু-পাখি বা অন্য যে কোন রূপকের মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন" (মুহম্মদ আবদুল খালেক, ৪০২)।

উপসংহার

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যানে'র পশুকাহিনি অংশে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল পশুচরিত্রগুলো মানবচরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। তৎকালীন সমাজবাস্তবতা, সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার, প্রজার দুর্বিষহ জীবন, নারীর অবস্থা, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই প্রভৃতি বিষয়গুলো উঠে এসেছে উপাখ্যানের এই অংশে। এই পশুচরিত্রগুলো মানুষের মতোই কথা বলে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করে, কোনো বিষয়ে তাদের অভিযোগ তুলে ধরতে পারে, একতাবদ্ধ হয়ে আবার তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করে। বাস্তবজীবনের করুণ চিত্রের পাশাপাশি তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। পশুকাহিনিতে মধ্যযুগীয় সামন্তশাসিত নিপীড়িত প্রজার জীবনচিত্রের পাশাপাশি আধুনিক গণতান্ত্রিক নাগরিকের আচরণও পরিলক্ষিত হয়। এই কাহিনিতে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন দিক। উপকথায় চর্চিত হয়েছে জনজীবনের নানা অনুষঙ্গ।

তথ্যসূত্র

অরবিন্দ পোদ্দার। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯।

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। *লোক-সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]*। ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা.। *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : আলোচনা ও পর্যালোচনা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬।

ওয়াকিল আহমদ। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮।

ক্ষুদিরাম দাস সম্পা.। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী [প্রথম খণ্ড]*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

ক্ষেত্র গুপ্ত। *কবি মুকুন্দরাম*। কলিকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

দীনেশচন্দ্র সেন। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [২য় খণ্ড]*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২।

মুহম্মদ আবদুল খালেক। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা.। *কালকেতু উপাখ্যান*। ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

শিপ্রা সরকার। *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'*। ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৭।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।